Md. Minhazul Kabir
https://minhazulkabir.com
Email: mdminhazulkabir@gmail.com

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী)

প্রথম অধ্যায়- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত Version: 1.0

~ভার্চুয়াল রিয়েলিটি~

সংজ্ঞাঃ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে তৈরি ত্রিমাত্রিক পরিবেশ যা ব্যবহারকারীর কাছে সত্য ও বাস্তব বলে মনে হয়। একে সিমুলেটেড পরিবেশও বলা হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে বাস্তব অনুভব করার জন্য তথ্য আদান প্রদানকারী বিভিন্ন ধরণের ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। যেমন-

1) মাথায় হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে,
2) হাতে একটি ডেটা গ্লোভ,
3) শরীরে একটি পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুট

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার:

1) **শিক্ষাক্ষেত্রঃ** শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির অনেক প্রভাব রয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার জটিল বিষয়গুলো সহজে উপস্থাপন এবং পাঠদানের বিষয়টি সহজে চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী করা যায়।
2) **চিকিৎসাক্ষেত্রঃ** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহারের অন্যতম বৃহৎ ক্ষেত্র হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞান। এই প্রযুক্তিতে সিমুলেশনের মাধ্যমে জটিল সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। চিকিৎসকদের নতুন চিকিৎসা সম্পর্কে ধারণা অর্জন বা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
3) **খেলাধুলা ও বিনোদনঃ** ভার্চুয়াল রিয়েলিটির কল্যাণে কম্পিউটারের সাথে কোন খেলায় অংশগ্রহন বা কম্পিউটার সিস্টেমে অনুশীলন সহজ হচ্ছে। দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক সিমুলেশনের মাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নির্ভর ছবি যা সবার কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।
4) **ড্রাইভিং নির্দেশনাঃ** ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে গাড়ি চালনার বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব ধারণা লাভ করা যায়। ফলে প্রশিক্ষণার্থী দ্রুত গাড়ি চালনা শিখতে পারছে। এক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণও কমে যাচ্ছে।
5) **সেনাবাহিনী প্রশিক্ষণঃ** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে সেনাবাহিনীতে অস্ত্র চালনা এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহারে কম সময়ে নিখুঁতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়।
6) **মহাকাশ অভিযানঃ** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে ত্রিমাত্রিক সিমুলেশনের মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছাত্র-শিক্ষকরা সৌরজগৎ এর গ্রহ বা গ্রহাণুপুঞ্জের অবস্থান, গঠনপ্রকৃতি ও গতিবিধি, গ্রহের মধ্যস্থিত বিভিন্ন বস্তু বা প্রাণের উপস্থিতি ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই ধারণা অর্জন করতে পারে।

~কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা~

সংজ্ঞাঃ মানুষ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, কৃত্তিম উপায়ে কোন যন্ত্র যদি সেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তখন সেই যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তাকে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়।

অথবাঃ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে মেশিনে সিমুলেশন করা যা মানুষের মত চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কোনও মেশিন বা সফ্টওয়্যার বিষয়গুলো অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রয়োজন: গণিত, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নিউরন স্টাডি, পরিসংখ্যান

এক্সপার্ট সিস্টেমঃ এক্সপার্ট সিস্টেম হলো কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন যা অসাধারণ মানব বুদ্ধির ন্যায় এবং দক্ষতার সাথে একটি নির্দিষ্ট জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি করা হয়।

অন্যভাবে বলা যায়- এক্সপার্ট সিস্টেম হলো কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এমন একটি সিস্টেম যা মানুষের চিন্তা-ভাবনা করার দক্ষতা এবং সমস্যা সমাধানের সক্ষমতাকে একত্রে ধারণ করে। এটি মানব মস্তিস্কের মত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সর্বোচ্চ সাফল্য লাভের উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এই সিস্টেমে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার দিয়ে সমৃদ্ধ থাকে, যাকে নলেজবেজ বলা হয়। এই নলেজবেজে যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়া যায়।

এক্সপার্ট সিস্টেম এর ব্যবহার:

১। রোগীর রোগ নিরাময়ে
২। বিভিন্ন ডিজাইনের ভূল সংশোধনে।
৩। জেট বিমান চালনায় ও সিডিউল তৈরিতে।
৪। ভূগর্ভস্থ তেল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

~রোবটিকস~

সংজ্ঞাঃ প্রযুক্তির যে শাখায় রোবটের ডিজাইন, গঠন, পরিচালন ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে রোবটিকস বলা হয়।

রোবটঃ রোবট হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এক ধরণের ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা কোন ব্যক্তির নির্দেশে কাজ করতে পারে।

রোবটের বৈশিষ্ট্যঃ

১। রোবট সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত যা সুনির্দিষ্ট কোন কাজ দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারে।
২। রোবট পূর্ব থেকে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে।
৩। রোবট বিরতিহীনভাবে বা ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে পারে।
৪। রোবট যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে কাজ করতে পারে।
৫। এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে বা স্থানান্তরিত হতে পারে।
৬। দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে রোবট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রোবটের ব্যবহারঃ

1) রোবটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফেকচারিং এ, বিশেষ করে যানবাহন ও গাড়ি তৈরির কারখানায়।
2) যে সমস্থ কাজ করা স্বাভাবিকভাবে মানুষের জন্য বিপজ্জনক যেমন- বিস্ফোরক নিস্ক্রিয়করণ, ডুবে যাওয়া জাহজের অনুসন্ধান, খনি অভ্যন্তরের কাজ ইত্যাদি কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বা বিপদজ্জনক ও জটিল কাজগুলো রোবটের সাহায্যে করা যায়।
3) সামরিক ক্ষেত্রেও রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে বোমা অনুসন্ধান কিংবা ভূমি মাইন সনাক্ত করা।
4) কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানা রকম বিপজ্জনক ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ যেমন- ওয়েল্ডিং, ঢালাই ,ভারী মাল উঠানো বা নামানো, যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোবট বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।
5) চিকিৎসাক্ষেত্রে জটিল অপারেশনে ও নানা ধরণের কাজে রোবট সার্জনদের সহায়তা করে থাকে।
6) মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রোবটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মহাকাশ অভিযানে এখন মানুষের পরিবর্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।

~ক্রায়োসার্জারি~

সংজ্ঞাঃ ক্রায়োসার্জারি হলো এক ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে অত্যধিক শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করে শরীরের অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করা হয়। ~~ক্রায়োসার্জারিকে অনেক সময় ক্রায়োথেরাপি বা ক্রায়োবায়োলেশনও বলা হয়।~~

ক্রায়োজনিক এজেন্টঃ এই পদ্ধতিতে রোগাক্রান্ত অংশ হিমায়িত করার জন্য নিমোক্ত ক্রায়োজনিক এজেন্ট বা গ্যাসগুলো ব্যবহার করা হয়-

1) তরল নাইট্রোজেন
2) তরল আর্গন গ্যাস
3) তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস
4) ডাই মিথাইল ইথাইল প্রোপ্রেন

ক্রায়োসার্জারি ব্যবহার:

1) ত্বকের ছোট টিউমার , তিল , আচিল , মেছতা , ত্বকের ক্যান্সার চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি ব্যবহার করা হয় ।
2) ক্রায়োসার্জারি দ্বারা অভ্যন্তরীণ কিছু রোগ যেমন – যকৃত ক্যান্সার , প্রস্টেট ক্যান্সার , ফুসফুস ক্যান্সার , মুখের ক্যান্সার , গ্রীবাদেশীয় গোলযোগ , পাইলস ক্যান্সার , স্তন ক্যান্সার ইত্যাদির চিকিৎসাও করা হয় ।

ক্রায়োসার্জারির সুবিধা:

1) ক্রায়োসার্জারির সুবিধা হলো এটি বারবার করা সম্ভব।
2) এটি সাধারণ সার্জারির চেয়ে কম বেদনাদায়ক।
3) ক্রায়োসার্জারি অন্যান্য চিকিৎসার চেয়ে কম ব্যয়বহুল।
4) এই পদ্ধতিতে তাপমাত্রা যখন হিমাঙ্কের নিচে নামানো হয় তখন সংশ্লিষ্ট স্থান হতে রক্ত সরে যায় এবং রক্তনালিগুলো সংকুচিত হয় ফলে রক্তপাত হয় না বললেই চলে, হলেও খুব কম।
5) বহুল প্রচলিত কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি এবং বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের চেয়ে এই পদ্ধতির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম।

~বায়োমেট্রিক্স~

সংজ্ঞাঃ বায়োমেট্রিক্স হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে কোন ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় অথবা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা হয়।

শারীরবৃত্তীয় (গঠনগত) বৈশিষ্ট্যঃ

১। ফেইস (Face)
২। আইরিস এবং রেটিনা (Iris & Retina)
৩। ফিংগার প্রিন্ট (Finger Print)
৪। হ্যান্ড জিওমেট্রি (Hand Geometry)
৫। ডি.এন.এ (DNA)

আচরণগত বৈশিষ্ট্যঃ

১। ভয়েস (Voice)
২। সিগনেচার (Signature)
৩। টাইপিং কীস্ট্রোক (Typing Keystroke)

বায়োমেট্রিক্স সিস্টেম কীভাবে কাজ করে?

১। সেন্সর ব্যবহার করে প্রার্থী বা ব্যবহারকারীর কাছ থেকে নমুনা গ্রহণ করে।
২। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট ব্যবহার করে নমুনা থেকে গুরুত্তপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো বের করে আনে।
৩। অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে ডেটাবেজে সংরক্ষিত নমুনার সাথে ইনপুটকৃত নমুনার তুলনা করে।
৪। যখন ইনপুট নমুনা ডেটাবেজের কোন একটি নমুনার সাথে মিলে তখন বায়োমেট্রিক সিস্টেম ব্যক্তিকে অ্যাক্সেস করতে দেয়; অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করে।

ফিংগার প্রিন্ট রিকগনিশন সিস্টেমঃ

এটি বায়োমেট্রিক সিস্টেমে ব্যক্তি সনাক্তকরণের জন্য সর্বাধিক পরিচিত এবং ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক সমাধান। ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় রিকগনিশন সিস্টেম ।

ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার আলোক-সংবেদনশীল মাইক্রোচিপ ব্যবহার করে ফিঙ্গার প্রিন্টের ডিজিটাল চিত্র তৈরি করে। তারপর কম্পিউটার ফিঙ্গার প্রিন্টের ডিজিটাল চিত্রটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করে বিশ্লেষণ করে এবং প্যাটার্ন-ম্যাচিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডেটাবেজে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্টের নমুনার সাথে তুলনা করে কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে।

ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার এমন একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস যা কোনও ফিঙ্গার প্রিন্টকে ইনপুট হিসাবে নেয় এবং ডেটাবেজে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্টের নমুনার সাথে তুলনা করে।

সুবিধাঃ

১। খরচ তুলনামূলক কম।
২। সনাক্তকরণের জন্য সময় কম লাগে।
৩। এটি সবচেয়ে সমসাময়িক পদ্ধতি।
৪। এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত।
৫। এটি মেমোরির জায়গা কম নেয়।

হ্যান্ড জিওমেট্রি রিকগনিশন সিস্টেমঃ

প্রতিটি মানুষের হাতের আকৃতি ও জ্যামিতিক গঠনেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বায়োমেট্রিক ডিভাইস দ্বারা হ্যান্ড জিওমিট্রি পদ্ধতিতে মানুষের হাতের আকৃতি বা জ্যামিতিক গঠন ও হাতের সাইজ ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে মানুষকে সনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডার হাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, পুরুত্ত, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য ও অবস্থান এবং সামগ্রিকভাবে হাড়ের কাঠামো ইত্যাদি পরিমাপ করে ডেটাবেজে সংরক্ষিত হ্যান্ড জিওমেট্রির নমুনার সাথে তুলনা করে ব্যক্তি সনাক্ত করে ।

ফেইস রিকগনিশন সিস্টেমঃ

ফেইস রিকগনিশন সিস্টেমে মানুষের মুখের গঠন প্রকৃতি পরীক্ষা করে তাকে সনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর মুখের চোয়াল ও চিবুকের আকার-আকৃতি, চোখের আকার ও অবস্থান, দুই চোখের মধ্যবর্তী দূরত্ব, নাকের দৈর্ঘ্য এবং ব্যাস, চোয়ালের কৌণিক পরিমাণ ইত্যাদি তুলনা করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়।

দ্বিমাত্রিক ফেসিয়াল স্ক্যানারগুলো মুখের জ্যামিতিক গঠন পড়ে এবং গ্রিডে রেকর্ড করা শুরু করে। মুখের জ্যামিতিক গঠনটি পয়েন্টে রপান্তরিত হয় যা অ্যালগরিদমের সাহায্যে ডেটাবেজে সংরক্ষিত নমুনার সাথে তুলনা করে ফলাফল দেয়।

আইরিস রিকগনিশন সিস্টেমঃ

বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তিতে ব্যক্তি সনাক্তকরনের জন্য চোখের আইরিসকে আদর্শ অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আইরিস রিকগনিশন সিস্টেমে মানুষের চোখের আইরিস প্যাটার্নের ভিত্তিতে কাজ করে। একজন ব্যক্তির চোখের আইরিস এর সাথে অন্য ব্যক্তির চোখের আইরিস এর প্যাটার্ন সবসময় ভিন্ন হয়।

চোখের অক্ষিগোলকের সামনের লেন্সের ওপরে অবস্থিত রঙিন পর্দাকে আইরিশ বলে। চোখের মাঝে গাঢ় গোল অংশটির নাম পিউপিল বা চোখের মণি। এর চারপাশেই আইরিশের অবস্থান। এটি পিউপিলের ছোট বা বড় হওয়ার আকার নিয়ন্ত্রণ করে। চোখের আইরিশ যখন প্রসারিত হয়, তখন পিউপিল ছোট হয়ে যায়। আবার আইরিশ সংকুচিত হলে পিউপিল বড় হয়। আইরিশ দেখতে অনেকটা আংটির মতো। এটি বাদামি, সবুজ, নীল—বিভিন্ন রঙের হয় এবং আলোর তীব্রতার ওপর নির্ভর করে সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। এতে পিউপিলের আকার পরিবর্তনসহ লেন্স ও রেটিনায় আপতিত আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত হয়।
আইরিস রিকগনিশন সিস্টেমে চোখের চারপার্শ্বে বেষ্টিত রঙিন বলয় বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা হয়

ডি.এন.এ (DNA) রিকগনিশন সিস্টেমঃ

ডিওক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) হলো জিনগত উপাদান যা কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত। প্রতিটি মানুষ তার ডিএনএতে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।
ডিএনএ যে কোনও সংখ্যক উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেমন- রক্ত, চুল, আঙুলের নখ, মুখের ত্বক, রক্তের দাগ, লালা এবং একবার বা দুবার ব্যবহার করা যেকোন জিনিস থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা যায়।
ডিএনএ প্রোফাইলিংয়ের এর সাহায্যে ব্যক্তি সনাক্তকরণের বিষয়টি অনেক বেশি বিজ্ঞান সম্মত। কোন মানুষের দেহ কোষ থেকে ডিএনএ আহরণ করার পর তার সাহায্যেই কতিপয় পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসারে ঐ মানুষের ডিএনএ প্রোফাইল করতে হয়।

ভয়েস রিকগনিশন সিস্টেমঃ

ভয়েস এবং স্পিচ রিকগনিশন দুটি পৃথক বায়োমেট্রিক পদ্ধতি যা মানুষের কণ্ঠের উপর নির্ভরশীল। উভয়ই যোগাযোগহীন, সফ্টওয়্যার ভিত্তিক প্রযুক্তি।
ভয়েস রিকগনিশন, সাধারণত ভয়েসপ্রিন্ট হিসাবেও উল্লেখ করা হয়, এটি ভোকালের সাহায্যে ব্যক্তি সনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম।
ভয়েস রিকগনিশন পদ্ধতিতে সকল ব্যবহারকারীর কণ্ঠকে, সফটওয়্যারের সাহায্যে ইলেক্ট্রিক সিগন্যালে রুপান্তর করে প্রথমে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করতে হয় এবং একজন ব্যবহারকারীর কণ্ঠকে ডেটাবেজে সংরক্ষিত ভয়েস ডেটা ফাইলের সাথে তুলনা করে কোন ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়।

অসুবিধাঃ

১। অসুস্থতা জনিত কারনে কোন ব্যবহারকারীর কণ্ঠ পরিবর্তন হলে সেক্ষেত্রে অনেক সময় সঠিক ফলাফল পাওয়া যায় না।
২। সূক্ষ্মতা তুলনামূলকভাবে কম।

সিগনেচার ভেরিফিকেশন সিস্টেমঃ

সিগনেচার ভেরিফিকেশন পদ্ধতিতে হাতে লেখা স্বাক্ষরকে পরীক্ষা করা হয়। এই পদ্ধতিতে স্বাক্ষরের আকার, লেখার গতি, লেখার সময় এবং কলমের চাপকে পরীক্ষা করে ব্যবহারকারীর স্বাক্ষর সনাক্ত করা হয়। একটি স্বাক্ষরের সকল প্যারামিটার ডুপ্লিকেট করা সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় বিশেষ ধরণের একটি কলম এবং প্যাড বা টেবলেট পিসি ।

টাইপিং কীস্ট্রোক রিকগনিশন সিস্টেমঃ

টাইপিং কীস্ট্রোক রিকগনিশন সিস্টেমে ব্যবহারকারীর টাইপিং ধরণ, ছন্দ এবং কীবোর্ডে টাইপের গতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তি সনাক্ত করা হয়। কীস্ট্রোক রিকগনিশন সিস্টেমে dwell time এবং flight time ব্যবহৃত হয়।
dwell time – যতক্ষণ সময় কী(KEY) টি চাপ দেওয়া হয়
flight time – একটি কী ছেড়ে দেওয়া এবং পরবর্তী কী চাপ দেওয়ার মধ্যবর্তী সময়

বায়োমেট্রিক এর ব্যবহার / বায়োমেট্রিক কোথায় ব্যবহৃত হয় ?

১। কোন কক্ষ, প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ও যেকোন ডিজিটাল সিস্টেম এর প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ
২। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতি রেকর্ড করতে।
৩। পাসপোর্ট তৈরি
৪। ড্রাইভিং লাইসেন্স তৈরি
৫। ব্যাংকের লেনদেনের নিরাপত্তায়
৬। ATM বুথের নিরাপত্তায়

বায়োমেট্রিক এর সুবিধা

1) পাসওয়ার্ড ভুলে যাওয়া বা চুরি হওয়ার কোন সমস্যা নেই
2) ইতিবাচক এবং নির্ভুল সনাক্তকরণ
3) সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা
4) নিরাপদ এবং ব্যবহার বান্ধব

~বায়োইনফরমেটিক্স~

সংজ্ঞাঃ বায়োইনফরমেটিক্স বিজ্ঞানের এমন একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় ক্ষেত্র, যেখানে কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ডেটাসমূহ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়।
কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানকে ব্যবহার করে জৈবিক সমস্যা সমাধানের বিজ্ঞান হলো বায়োইনফরমেটিক্স।

বায়োইনফরমেটিক্স এর উদ্দেশ্যঃ

১। প্যাটার্ন রিকগনিশন, ডেটা মাইনিং, ভিজুয়ালাইজেশন ইত্যাদির সাহায্যে জৈবিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুধাবন করা। অর্থাৎ জীন বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান করে জ্ঞান তৈরি করা।

২। রোগ-বালাইয়ের কারণ হিসেবে জীনের প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা।

৩। ঔষধের গুণাগুণ উন্নত ও নতুন ঔষধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করা।

~জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং~

সংজ্ঞাঃ জীবদেহে জিনোমকে (জিনের সেটকে) প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে কিংবা একাধিক জীবের জিনোমকে জোড়া লাগিয়ে নতুন জীবকোষ সৃষ্টির কৌশলই হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ।

অথবা,

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয় যার সাহায্যে কোষের জেনেটিক কাঠামো পরিবর্তন করে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উন্নত বা অভিনব জীব উৎপাদন করা হয় ।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যাকে জেনেটিক মডিফিকেশন বা জেনেটিক ম্যানিপুলেশন বলা হয়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে কোনও জীবের জিনের সরাসরি ম্যানিপুলেশন বা পরিবর্তন করা হয় ।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA (DeoxyriboNucleic Acid) – প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয় ।

রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহঃ ১। DNA নির্বাচন, ২। DNA এর বাহক নির্বাচন,, ৩। DNA খণ্ড কর্তন, ৪। খণ্ডনকৃত DNA প্রতিস্থাপন, ৫। পোষকদেহে রিকম্বিনেন্ট DNA স্থানান্তর, ৬। রিকম্বিনেন্ট DNA এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মূল্যায়ন ।

কৃষিক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তাঃ এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় কৃষি খাতে। কৃষি গবেষণায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই পর্যন্ত অনেক ট্রান্সজেনিক ফসল আবিষ্কার করা হয়েছে। তার মধ্যে উন্নত প্রজাতির ধান উল্লেখযোগ্য। এই প্রযুক্তির সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের খাদ্য সমস্যা অনেকটা দূর করা সম্ভব । কৃষিক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভূমিকা ব্যাপক । উন্নত মানের ফসল, সহনশীল জাত, বৈচিত্রতা সবই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে হয়েছে । বর্তমানে পোমাটো নামের একটি উদ্ভিদ আছে যে উদ্ভিদে একই সাথে টমোটো ও আলু উভয়ই উৎপন্ন হয়। এছাড়া নিম্ন লিখিত কাজে ব্যপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথাঃ

১। শস্যের গুণাগুণ মান বৃদ্ধি করা

২। শস্য থেকে সম্পূর্ণ নতুন উপাদান উৎপাদন করা

৩। পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের হুমকি থেকে শস্যকে রক্ষা করা

৪। শস্যের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো

৫। মৎস উন্নয়নেঃ এখন আমরা অনেক বড় ধরনের রুই মাছ,তেলাপিয়া,কার্প ইত্যাদি দেখে থাকি, এছাড়াও আগে বাজারে অনেক মাছ দেখতাম যেগুলো আগে ছোট ছিল কিন্তু ইদানীং সেই মাছগুলো আশ্চর্যজনক ভাবে একটু বড় দেখায়। আসলে এসবই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জাদু।

এছাড়া উন্নতমানের ফসল উৎপাদন, গৃহপালিত পশু উৎপাদন, রোগের চিকিৎসা, হরমোন তৈরি, ভাইরাসনাশক, ফারমাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন, টিকা ও জ্বালানি তৈরি, জেনেটিক ত্রুটিসমূহ নির্ণয়, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহারঃ বর্তমানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে হচ্ছে তার মধ্যে; চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, শিল্প ও কৃষিসহ আরো অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে।

1) জিন থেরাপি যেখানে আপনি কোনও নির্দিষ্ট রোগের চিকিৎসা করার জন্য ত্রুটিযুক্ত ডিএনএর জায়গায় একটি একটি সুস্থ ডিএনএ প্রয়োগ করতে পারবেন। জিন থেরাপি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটি সুফল।এর মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা ও ত্রুটিপূর্ণ মানুষের জিন পরিবর্তন করে সুস্থ করে তোলা যায়। মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জিনকে ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবিষ্ট করে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন উৎপাদন হল এর সবচেয়ে বড় সুফল।
2) ফার্মাসিউটিক্যালঃ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে জিনের ক্লোনিং করে তা ফার্মেসি শিল্পে ব্যবহৃত।যারা ডায়বেটিস রোগী আছেন বা যাদের পরিবারের কেউ ডায়াবেটিস রোগী থেকে থাকলে তারা সবাই ইনসুলিনের সাথে পরিচিত । এই ইনসুলিন মানব দেহের অগ্নাশয়ের আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স কোষ থেকে জিন ক্লোনিং এর মাধ্যমে আসে।
3) শস্য এবং পশুসম্পদকে আরও বাণিজ্যিকভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
4) পরিবেশ সুরক্ষাঃজেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ব্যাক্টেরিয়া তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।যেগুলোর পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।
5) জেনেটিক ত্রুটিসমূহ নির্ণয় করা যায় । উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে ক্রিয়ামূলক জিনের সাথে ত্রুটিযুক্ত জিনগুলি প্রতিস্থাপন করা যায়।
6) বর্তমানে অন্ধত্ব প্রতিরোধে ভিটামিন এ দিয়ে চাল তৈরি করেছে।
7) এর মাধ্যমে ইনসুলিন, হিউম্যান গ্রোথ হরমোন এবং ভ্যাক্সিন তৈরি করা হয়।
8) ভাইরাসনাশক তৈরিঃ মানুষের কোষ থেকে এক ধরণের রসকে কাজে লাগিয়ে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিয়াররা ভাইরাসনাশক তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন ।
9) হরমোন তৈরিঃ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সুফলে গ্রোথ হরমোন তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে । যার ফলে মানুষ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপকারিতাঃ

1. এটি কৃষিক্ষেত্রকে সম্ভাবনাময় করে তোলেছে।
2. নতুন খাবার উৎপাদনে বড় ভূমিকা রাখছে।
3. এটি আমাদের আরও ভাল খাদ্য পণ্য তৈরি করতে দেয়।

4. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং রোগ প্রতিরোধের উন্নতি করতে সহায়তা করছে।
5. অল্প বয়স্ক ও অনাগত শিশুদের সমস্ত অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ায় সহায়তা করছে। অনেক ক্ষেত্রে সন্তান মার পেটে থাকলে সন্তানের অনেক ত্রুটি দেখা যায়।জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে এসব ত্রুটি সন্তান পেটে থাকলেই সংশোধন করা যায়।ফলে, সন্তান কোন রকমের ত্রুটি ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে।
6. জৈব প্রযুক্তি আমাদের কীটপতঙ্গ প্রতিরোধের জেনেটিক স্তর তৈরি করতে দেয়।
7. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের ওষুধ গবেষণা কাজকে উন্নত করে।

~ন্যানো টেকনোলজি~

সংজ্ঞাঃ পারমাণবিক বা আণবিক স্কেলে অতিক্ষুদ্র (১ থেকে ১০০ ন্যানোমিটার আকৃতির) ডিভাইস তৈরি করার জন্য ধাতব বস্তুকে সুনিপুণভাবে কাজে লাগানোর বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিকে ন্যানো প্রযুক্তি বা টেকনোলজি বলে ।

ন্যানোটেকনোলজি এর মাধ্যমে কম্পিউটার/ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের চিপ (chip) তৈরি করা হয় ।

১ মিটারের ১০০ কোটি ভাগের এক ভাগকে বলা হয় ১ ন্যানো মিটার। অর্থাৎ $1\ nm = 10^{-9}\ m$।

ন্যানো টেকনোলজিতে দুটি প্রধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। একটি হলো "bottom-up" বা নিচ থেকে উপরে এবং অপরটি "top-down" বা উপর থেকে নিচে।

1) "bottom-up" পদ্ধতিতে, বিভিন্ন উপকরণ এবং ডিভাইসগুলো আণবিক উপাদানগুলো থেকে তৈরি করা হয় যা আণবিক নীতির দ্বারা রাসায়নিকভাবে নিজেদেরকে একত্রিত করে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র আকারের জিনিস দিয়ে বড় আকারের জিনিস তৈরি করা হয়।
2) "top-down" পদ্ধতিতে ন্যানো-অবজেক্টগুলি পারমাণবিক স্তরের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বৃহত্তর বস্তু থেকে নির্মিত হয়। টপ-টু-ডাউন পদ্ধতিতে কোন জিনিসকে কেটে ছোট করে তাকে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়।

আমাদের বর্তমান ইলেক্ট্রনিক্স হল, "top-down" প্রযুক্তি। আর ন্যানোটেকনোলজির হল "bottom-up" প্রযুক্তি।

★ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহারঃ

1) **কম্পিউটার হার্ডওয়্যার তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** কম্পিউটার এর ভিতর যে প্রসেসর আছে, তা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ন্যানোমিটার স্কেলের সার্কিট। আর তাতে ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানোটেকনোলজি। ইন্টেল প্রসেসরে, সিলিকন এর উপর প্যাটার্ণ করে সার্কিট বানান হয় তার বর্তমান সাইজ হল ১০ ন্যানোমিটার। ভবিষ্যতে এর আকার হবে ১.৮ ন্যানোমিটার। প্রসেসর গতি উচ্চ থেকে উচ্চ হয় । স্থায়িত্ব বাড়ে, কম বিদ্যুৎ শক্তি খরচ করে । কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের তথ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে ন্যানোটেকনোলজির প্রয়োগের কারণে।
2) **ন্যানো রোবট তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে অতি ক্ষুদ্র রোবট তৈরির গবেষণা চলছে , যার সাহয্যে মানবদেহের অভ্যন্তরের অস্ত্রপচার সম্ভব হবে।
3) **ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহাররে ফলে ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রপাতি আকারে ছোট, ওজনে হালকা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হচ্ছে।
4) **জ্বালানি তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য অতিক্ষুদ্র সৌরকোষ তৈরি, কম খরচে জ্বালানি তৈরি, এবং বিভিন্ন প্রকার ব্যাটারির জন্য ফুয়েল সেল তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে।
5) **প্যাকেজিং ও প্রলেপে ন্যানো টেকনোলজিঃ** বিভিন্ন খাদ্যজাত পণ্যের প্যাকেজিং ও প্রলেপ তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে । ফলে খাদ্যের মান দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ থাকে ।
6) **ঔষধ তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** স্মার্ট ড্রাগ তৈরিতে ঔষধ শিল্পে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে ।
7) **খেলাধুলার সামগ্রী তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** টেনিস বলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি, বাতাসে গলফ বলের দিক ঠিক রাখার জন্য, র‍্যাকেটের শক্তি ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে । খেলোয়াড়দের জুতা, মোজা, ট্রাউজার প্রভৃতির স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি এবং আরামদায়ক করার জন্য ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে ।
8) **বস্ত্র শিল্পে ন্যানো টেকনোলজিঃ** বস্ত্র শিল্পে কাপড়ের ওজন ও ঘনত্ব ঠিক রাখার জন্য ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হচ্ছে ।
9) **কৃত্তিম অঙ্গ-পতঙ্গ তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** ন্যানো টেকনোলজির সাহায্যে অনুভূতিসম্পন্ন বিভিন্ন কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি সম্ভব ।
10) **টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজিঃ** সানস্ক্রিন এ ব্যবহৃত টিটানিয়াম ডাই-অক্সাইড তৈরিতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।
11) **মহাকাশ অভিযানে ন্যানো টেকনোলজিঃ** মহাকাশ অভিযানে ব্যবহৃত বিভিন্ন নভোযানকে হালকা করে তৈরি করতে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহৃত হয়।

ন্যানো টেকনোলজির সুবিধাঃ

১। ন্যানোটিউব, ন্যানোপার্টিকেল ইত্যাদি দ্বারা তৈরি পণ্য অধিক মজবুত ও টেকসই, আকারে তুলনামূলক ছোট এবং ওজনে হালকা ।

২। ন্যানো টেকনোলজির প্রয়োগে উৎপাদিত ঔষধ "স্মার্ট ড্রাগ" ব্যবহার করে দ্রুত আরগ্য লাভ করা যায় ।

৩। খাদ্যজাত পণ্যের প্যাকেজিং এর সিলভার তৈরির কাজে ।

৪। ন্যানো ট্রান্সজিস্টর, ন্যানো ডায়োড, প্লাজমা ডিসপ্লে ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে ইলেকট্রনিক শিল্পে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে ।

৫। ন্যানো প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি ব্যাটারি, ফুয়েল সেল, সোলার সেল ইত্যাদির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে অধিক্তর কাজে লাগানো যায় ।

৬। ন্যানো টেকনোলজির প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্র বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ।

বায়োমেট্রিক্স ও বায়োইনফরমেট্রিক্স এর পার্থক্য

বায়োমেট্রিক্স	বায়োইনফরমেট্রিক্স
১. বায়োমেট্রিক্স হলো বায়োলজিক্যাল ডেটা মাপা এবং বিশ্লেষণ কার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি।	১. জীবজ্ঞানের সমস্যাগুলোর যখন কম্পিউটার প্রযুক্তি কৌশল (কম্পিউটেশনাল টেকনিক) ব্যবহার করে সমাধান করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় বায়োইনফরমেটিক্স।
২. বায়োমেট্রিক্স প্রযুক্তি মানুষের দেহের বৈশিষ্ট্য (যেমন: ডিএনএ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের রেটিনা এবং আইরিস, কণ্ঠস্বর,চেহারা এবং হাতের মাপ ইত্যাদি) মেপে এবং বিশ্লেষণ করে বৈধতা নির্ণয় করে।	২. বায়োইনফরমেটিক্স হলো বিজ্ঞানের সে শাখা, যা বায়োলজিক্যাল ডেটা এনালাইসিস করার জন্য কম্পিউটার প্রযুক্তি, ইনফরমেশন থিয়োরি এবং গাণিতিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে।
৩. কম্পিউটার পদ্ধতিতে নিখুঁত নিরাপত্তার জন্য বায়োমেট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।	৩. মলিকুলার (আণবিক) জেনেটিক্স এর ভিজ্যুয়ালাইজেশনকে সম্ভব করে তুলতে বায়োইনফরমেটিক্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।
৪. এ পদ্ধতিতে মানুষের বায়োলজিক্যাল ডেটা কম্পিউটারের ডেটাবেজ সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এসব ডেটা নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিলিয়ে দেখা হয়। ডেটা মিল পেলে বৈধ বলে বিবেচিত হয় এবং অনুমতি প্রাপ্ত হয়।	৪. বিপুল পরিমাণ পুনরাবৃত্তিমূলক এবং অ-পুনরাবৃত্তিমূলক তথ্যসমূহের সংরক্ষণে সহায়তা করে। প্যাটার্ন রিকগনিশন এবং অ্যালগরিদমিক ডেটা মাইনিং করা যায়।
৫. এটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল প্রযুক্তি।	৫. এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি প্রযুক্তি। প্রকল্প চালিয়ে যেতে এবং প্রযুক্তি কিনতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন পড়ে।

পুনশ্চঃ

- এই নোটের সফট কপি https://minhazulkabir.com ঠিকানায় পাওয়া যাবে ।
- এই নোটে কিছু ভুল থাকতে পারে । তুমি যদি এই নোটে যদি কোনো ভুল পেয়ে থাকো কিংবা যদি তোমার মনে হয় কোনো টপিক যুক্ত করলে ভালো হবে । তাহলে, তুমি তোমার মতামত পাঠাতে পারো mdminhazulkabir@gmail.com ঠিকানায় । মেইলের বিষয় বস্তু Information and Communication Technology: World and Bangladesh Perspectives লিখতে ভুলো না যেনো !